উলে বোনা রূপকথা

একটি বই, আর কিছু ছবি। একসূত্রে গেঁথে হয়ে উঠেছে একটি রূপকথা। সেই রূপকথার গল্প বলছেন তুহিনশুভ্র।

সৃষ্টি ও কল্পনা দুটি ভিন্ন শব্দ হলেও এদের আভ্যন্তরীণ রূপটি কিন্তু এক। এরা দুজনেই একে অপরের দোসর। সৃষ্টি ও কল্পনা তাই সর্বদাই একে অন্যের হাত ধরাধরি করে চলে। কল্পনার গভীর স্পর্শে সৃষ্টি শরীর খুঁজে পায়। গড়ে ওঠে সৃষ্টির নির্মাণ। আর সৃষ্টির অন্তর-আকাশে আঁকা হয় কল্পনার রঙিন উড়ান। ঝিনুকের মাঝে মুক্তো যেমন, সৃষ্টির অন্দরে কল্পনার অবস্থান তেমনই। আর এই দুইয়ের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় গড়ে ওঠে সৃষ্টির স্বর্গীয় সুখ, সুখের অপার্থিব উল্লাস।

আবার অন্যদিকে, কল্পনার সাথে কঠোর বাস্তবতার চিরন্তন বৈরিতা। সৃষ্টির বীজ কল্পনার ডানায় ভর করে ততক্ষণই ভাসমান থাকে যতক্ষণ কঠোর বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু যখনই কল্পনার প্রতিমাকে ছুঁয়ে ফেলে বাস্তবের রূঢ় বর্বরতা, তখনই মৃত্যু হয় কোনও এক রূপকথার। ঘটে যায় এক অমোঘ এপিফ্যানি।

এমনই এক রূপকথা বুনেছিল কোনও এক দূরদেশের বৃদ্ধ ঠাম্মা তার সাধের উলকাঁটার স্নেহছায়ায়। অনেক পথ ঘুরে একদিন ঠাম্মা তার একমাত্র সম্বল দুটো উলকাঁটা আর কিছু উল নিয়ে পৌঁছল এক অজানা শহরে। সেখানে তার আপন বলতে কেউ নেই। নেই তেমন কোনও ভালোবাসার আশ্রয়। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লেও মনের গভীরে কেবলই গড়ে তোলার অদম্য নেশা। দীর্ঘ পথ হেঁটে ঠাম্মার পা দুখানি ব্যথায় ফুলে টনটন, তাই প্রথমেই ঠাম্মা রাস্তায় বসে বুনে নেয় একজোড়া স্লিপার। পা-দুখানা ঢাকার ব্যবস্থা তো হল। কিন্তু ধুলোভরা চারধার, জুতোজোড়া রাখবে কোথায়? তাই জুতোজোড়া রাখার আছিলায় বোনা হয়ে যায় একখানা চেকনাই মাদুর। কিন্তু

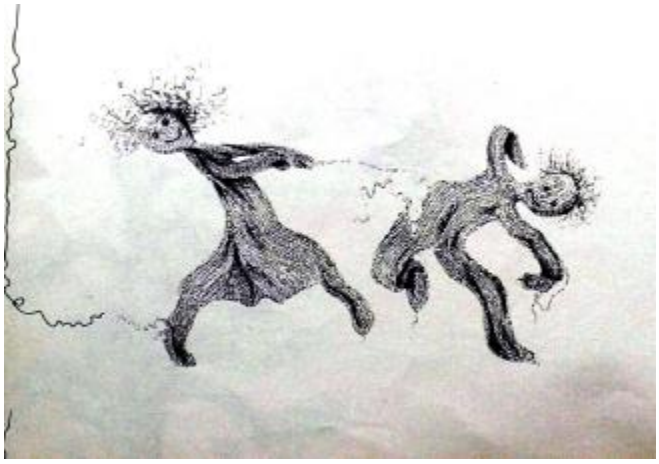

মাদুরটিও তো রাখতে হবে? ঠাম্মার উলকাঁটা খটখট শব্দে তক্ষুনি বুনে ফেলে একখানা আস্ত মেঝে। এইভাবে একে একে মাথা রাখার খাট হল, বাহারি বিছানা হল, গদি, তোষকও। জানালা, পর্দা, ফুলদানি।

'খটখট ঠাম্মা তাই শুরু করে ফের
দরজা-জানলা বোনে, বোনে শেড ল্যাম্পের।
বোনে কড়ি-বরগা, দেয়াল ও তারপর
ছাদ বোনে ঠাম্মা, বুনে ফেলে পুরো ঘর।'

ঠাম্মা বাঁচতে বড়ই ভালোবাসে। সে জানে বাঁচার মতো বাঁচাতে কত সুখ। তাই তো দৈনন্দিন অপরিহার্য জিনিসপত্রগুলো ঠাম্মার জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় একে একে প্রাণ পেতে থাকে। ঠাম্মা বোঝে ঘর মানে শুধু একটা নির্জীব বস্তু নয়। ঘর মানে একটা প্রাণে ঠাসা আশ্রয়, ছড়ানো-ছিটানো গেরস্থালি আর শিশুদের কলতান। শিশুদের দাপাদাপি ছাড়া সাজানো সংসার যে বড়ই প্রাণহীন, পানসে। তাই তো ঠাম্মা নিপুন হাতের কৌশলে নিমেষে বুনে নেয় নাতি-নাতনি – সকৌতুক দুষ্টুমিভরা তাদের চোখ-মুখ। তাদের ঝলমলে উপস্থিতি ঠাম্মাকে দু'দন্ড তিষ্টতে দেয় না। দস্যি বাচ্চাদের মুখে হাসির ঝিলিক যেন ফুরোতেই চায় না। ফুরোবে কী করে? তাদের জন্য ঠাম্মা যে রাতদিন এক করে নিরলস বুনে চলেছে খেলার মাঠ, গাছপালা, ফুলপাতা, দোলনা, ডাংগুলি-লুকোচুরি, আর হরেক খেলনা ঠাসা একখানা আস্ত আলমারি। সেইসব মনকাড়া খেলার সরঞ্জাম পেয়ে শিশুমনে আনন্দের সীমা থাকে কি? সারাদিন ধরে হুল্লোড় চলতে থাকে। ছুটোছুটি-টানাটানির মধ্যে কখন যে ভাইয়ের শরীরের পাশ থেকে কিছু উল খুলে বোনের হাতে চলে আসে, খেয়াল থাকে না। তাতেও খেলার বিরাম নেই! ঠাম্মা চটপট কাঁটাজোড়া হাতে নিয়ে খোলা উল জুড়তে বসে যায়।

এরপর কালো উলে বোনা হল পৌষের এক গভীর নিকষ রাত। পাছে ঠান্ডা লেগে যায় তাই নাতি-নাতনির জন্য ঠাম্মার অফুরান স্নেহের পরশে তৈরি হল নরম শয্যা, গরম কম্বল। আয়োজনের কোনও ত্রুটি নেই। ছোট্ট শরীরের গভীর চোখদুটিতে ঠাম্মা বুনে দিল সুখের নিদ্রা। কিন্তু ঠাম্মার কি অবসর আছে? ঠাম্মা তাদের মাথার পাশে বসে একে একে বুনে চলে চাঁদ, জ্যোৎস্না, মৃদু-মধু স্বপ্নের ঝংকার। পরদিন ভোরবেলা বইখাতা, পেন্সিল, স্কুলব্যাগ বোনা হয়ে গেল। খেলাধুলার পাশাপাশি তাদের লেখাপড়াও তো শিখতে হবে।

ঠাম্মা তাদের হাত ধরে স্কুলে নিয়ে গেল। আর এখানেই ঘটে গেল অমোঘ বিপত্তি। উলে বোনা বাচ্চাদের কি স্কুলে ভর্তি নেওয়া যায়?

"শিক্ষক যতসব করে তারা বিদ্রুপ –
'উলে-বোনা বাচ্চা? চলে যান চুপচুপ।
পড়াবোনা ওদেরকে, উলেবোনা বাচ্চা –
ক্লাসে নেই জায়গা, চলে যান, আচ্ছা!"

ঠাম্মা এতটুকুও বিচলিত হল না। এত সহজে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। কারণ ঠাম্মা জানে তার নাতি-নাতনি কারও থেকে কোনও অংশে কম নয়।

'বললেন ঠাম্মা, এতো বাপু অন্যায় –
বুদ্ধিতে উজ্জ্বল শিশুদুটো কোথা যায়?
তাড়াতাড়ি নেবেন না এই সিদ্ধান্ত,
চান্স দিলে বুঝবেন এরা গুনবন্ত।
ভর্তির যোগ্য যে তাতে নেই সংশয়
হতে পারে উলে-বোনা, সে এদের দোষ নয়!'

ঠাম্মার কথা শুনে শিক্ষকরা নড়েচড়ে বসল। শুরু হল তাদের খুঁটিয়ে নিরিক্ষণ করার কাজ। তাবড় শিক্ষক দেখেশুনে সিদ্ধান্ত নিল উলে-বোনা ছাত্রকে কখনওই ভর্তি নেওয়া যাবে না। 'উলে-বোনা ছেলে-পুলে, ঠাঁই নেই ইস্কুলে।' এদিকে ঠাম্মা তো আহাম্মক শিক্ষকদের কথা শুনে রাগে ফুঁসছে। এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়া যায় না। ঠাম্মা আবার উল বুনতে শুরু করল। এবার বোনা হল একটা লাল-টুকটুকে গাড়ি। এই গাড়ি করেই তার নাতি-নাতনিদের নিয়ে সে মেয়রের দফতরে যাবে। এতবড় অন্যায়ের সে একটা ন্যায্য বিহিত চায়। মেয়রের পারিষদগণ সকলেই গন্যমান্য বিচক্ষণ সভ্য। তারা এমন অর্বাচীন বিষয়ে কর্ণপাত করবেন কেন? বিষয়টাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনেই তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিলেন – সভ্য দেশে নাকি এমন উলে-বোনা ছেলেমেয়েদের কোনও স্থান নেই। টেলিগ্রামে এই বার্তা সমস্ত দফতরে জানিয়ে তারা চা ও জলখাবার খেতে উঠে গেলেন। ঠাম্মা এবাররেও এতটুকু দমল না। এত সহজে হার মেনে নেওয়া যায় কি? ঠাম্মা তার সংকল্পে অবিচল। নতুন উদ্যমে এবার একখানা আস্ত হেলিকপ্টার বোনার কাজ আরম্ভ হল। পৌরসভার সদস্য মাত্রই নিরেট নির্বোধ। তারা দেশের কতটুকুই বা খবর রাখে? তাই

এবার স্বয়ং রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার হোক। রাষ্ট্রপতির ডাকে তৎপরতার সাথে সভা বসল ঠিকই, কিন্তু সেখানেও ঠাম্মার কোনও ন্যায়বিচার জুটল না। সকলের খটকা একটাই – উলে-বোনা ছেলেপুলে, ঠাঁই নাই ইস্কুলে। কিন্তু মাঝখান থেকে যেটা ঘটে গেল তা হল – নাম না জানা অখ্যাত শহরটা রাতারাতি খ্যাতির শিখরে উঠে গেল ঠাম্মার উলে-বোনা সংসারের বদান্যতায়। চারিদিকে হইহই পড়ে গেল। কাছে-দূরের অসংখ্য মানুষ ভিড় জমাতে থাকল সেই বাড়িটা দেখবার জন্য। মেয়র পারিষদ মিটিং বসাল। সরকারের কাছে আর্জি জানানো হল বাড়িটা সংরক্ষণের জন্য। রাতারাতি গাছপালা, ফুলপাতা, ঘাসপথে মোড়া বাড়িটার চারিদিকে কাঁটাতারের রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। লোহার ফটকের সামনে রক্ষী বসল রাতদিন পাহারার জন্য। এদিকে ঠাম্মার ভিতরে অপমানের ঢেউ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এ দেশে এমন কেউ নেই যার কাছে ন্যায়বিচার পাওয়া যেতে পারে? শেষমেষ ঠাম্মা স্থির করল নিজের হাতে উলে-বোনা ঘরসংসার নিজেই খুলে ফেলবে। এ অধিকার কেবল তারই। মাঝরাতে লোকজন, পাহারাদার যখন গভীর ঘুমে মশগুল, ঠাম্মা বাড়িটার শেষ উলটুকুও টেনে খুলে ফেলল।

‘খোলে ফুল, খোলে বেড়া, দরজাও খুলল,
উলে-বোনা মেঝে খোলে, বলাই বাহুল্য।
যেই খোলা শেষ হল পুরো সেই বাড়িঘর,
খুলে ফেলে নাতনিকে, নাতিকেও তারপর।’

আর এক মুহূর্তও ঠাম্মা এই নির্বোধ শহরটায় থাকতে চায় না। ভোর হবার আগেই ছড়ি, কাঁটা, উল নিয়ে ঠাম্মা কোথায় যে চলে গেল, কেউ তার সন্ধান দিতে পারল না।

ঠাম্মা কি সত্যিই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল? সত্যিই কি সে আর উলকাঁটা নিয়ে বসবে না স্বপ্ন বুনতে? কল্পনার হাটে স্বপ্নের বেসাতি কি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল? ঠাম্মাই তো সত্যিকারের সেই শিল্পী যে তার নিজস্ব শিল্প-সৃষ্টিকে মানুষের মাঝে, মানুষের সাথে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিল। সৃষ্টি তো তখনই সার্থক যখন সে নিজেই সমাজের একটি অংশ হয়ে ওঠে। শিল্পের উন্মুক্ত চেতনা ব্যতিরেকে সমাজ যে বড়ই রসহীন, কর্কশ। শিল্পের এই উদার মনভাবকে বৃহত্তর সমাজ কি কখনও মুক্ত মনে গ্রহণ করতে পেরেছে? আজও কি পারে? এ দ্বন্দ্ব চিরদিনের। এই দ্বন্দ্বের কারণেই হয়ত

ভ্যান গঘের মতো শিল্পীকেও আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়। নিজের সৃষ্টি নিজের হাতেই ঠাম্মাকেও বিসর্জন দিতে হয়! কেননা শিল্পীর নিকটে নিজস্ব সৃষ্টি যে নিজের অন্তরাত্মারই সমান।

বই : ঠাম্মার উলবোনা

কাহিনী : উরি ওরলেভ

ছবি : ওরা এইতান

অনুবাদ : শিশিরকুমার দাশ

প্রকাশক : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয় সংযোজন : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়ার ISBN 81-237-2972-3 নম্বর বই 'ঠাম্মার উলবোনা' মূল হিব্রুতে প্রথম প্রকাশিত। ইনস্টিট্যুট ফর দ্য ট্রানশ্লেসন অফ হিব্রু লিটারেচার সংস্থার উদার সহায়তায় এই গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে। লেখক উরি ওরলেভ, ছবি ওরা এইতান, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ। গোটা কাহিনী সহজ ছন্দে আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে লেখা। মূল আকর্ষণ বইটির অলঙ্করণ। ছোটোদের জন্য এই বই তাদের মজাতো দেবেই, বড়োদের দেবে চিন্তার খোরাক। বইটির প্রতিটি ছবি এতটাই আকর্ষণীয় যে পড়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বইটি হাতে থেকে যায় অনেকক্ষণ, চোখের আরাম দেওয়ার জন্য। মনেরও।